রাখালের রাজগি

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

জ্যৈষ্ঠ—১৩২৭

এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত
গুপ্ত এণ্ড কোং
৪৯, রসারোড, ভবানীপুর

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা
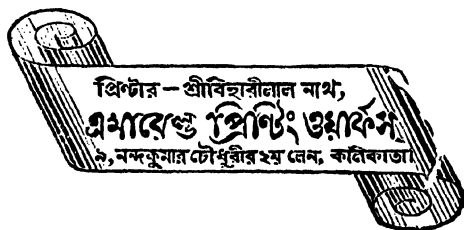
উৎসর্গ

মাননীয়

মহারাজা শ্রীযুক্ত স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

কে, সি, আই, ই বাহাদুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কোন দিন যিনি ব্রজের রাখালী ক'র্‌তেন, বাঁশীর সুরে মন ভোলাতেন, তিনি পরে মথুরায় গিয়ে একচ্ছত্র রাজা হোয়েছিলেন। আমরা তাঁর মথুরার স্বর্ণসিংহাসনের রেণু দেখে মুগ্ধ হই নি। বৃন্দাবনে যে তাঁর চরণরেণু পড়ে আছে, তাই তিলক ক'রে গৌরব ক'রে থাকি। তিনি মথুরায় রাজদণ্ড দিয়ে দুষ্টকে শাসন ক'র্‌তেন, আশ্রিতকে রক্ষা ক'র্‌তেন, কিন্তু তাঁর মনটা পড়েছিল, যমুনার তীরে মাধবীকুঞ্জের তলায়। সেখান থেকে তিনি তাঁকে কে কি রকম ভালবাসে, তা দেখ্‌বার জন্য দু'টি চোখ পথের দিকে ফেলে রাখ্‌তেন।

উৎসর্গ

মহারাজ, আপনি রাজত্ব লাভ করেছেন, কিন্তু এক সময়ে আপনিও সাধারণের একজন ছিলেন এবং সকলের সঙ্গে মিশে তাদের বন্ধুত্বের অভিমান ক'র্‌তেন। আপনি ঐশ্বর্য্যের রাজ-তক্তায় ব'সে সেই প্রীতির ক্ষেত্র ভোলেন নি। আপনার সুকুমার ভাবগুলি ধনরত্নের নীচে চাপা পড়েনি, বরং আরও বিকাশ পেয়েছে। রাজশক্তির পাশ কাটিয়ে আপনি হৃদয়কে বড় রেখেছেন;—মাধুর্য্যকে ঐশ্বর্য্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন ক'রেছেন। এই কারণে

"রাখালের রাজগি"

আপনার কর-কমলে সবহুমানে অর্পণ ক'র্‌লাম।

বেহালা
২৪শ পরগণা,
১০ই মে, ১৯২০।

বিনীত
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

অবতরণিকা——"রাজগি" কি ? এই প্রশ্ন অনেকের মুখে আমায় শুন্‌তে হয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গে ও হিন্দুস্থানে এ কথাটি খুবই প্রচলিত, ইহার অর্থ রাজ-পদ। 'রাখালের রাজগি' অর্থ রাখালের রাজ-পদ। কেউ কেউ প্রশ্ন কল্লেন, "রাখালের রাজ-পদ" লিখ্‌লেন না কেন ? উত্তরে এই বল্‌ব, বাঙ্গালা ভাষাটার দোর-জানেলা কষে বেঁধে ফেলা উচিত নয়। পূর্ব্ববঙ্গে যদি কোন শব্দ-সম্পদ থাকে—তা কি আট্‌কে রাখ্‌তে হবে ? সাহিত্যের আসরে তা স্থান পাবে না ?

বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই একটা চিন্তার স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তি আছে, এটি অন্যত্র সুলভ

নয়। কৃষ্ণ অন্যান্য দেশে ঠাকুর, কিন্তু এখানে তিনি আমাদেরই একজন। তিনি আমাদের সাথী হয়ে খেলেছেন, আমাদেরই ঘরে মায়ের হাতে তাড়া খেয়েছেন, আমাদেরই কুঞ্জে ব'সে মান ভেঙ্গেছেন। ভাগবতে যা'ই কেন লেখা থাকুক না, তাঁকে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে এমন করে আর কেউ বাড়ীর কাছে—ঘরের আঙ্গিনায় এনে আপনার ক'রে দেখ্‌তে পায় নি। তাঁর বিরহে বাঙ্গালীর মত এমন পাথরে মাথা খুঁড়ে আর কেউ কাঁদ্‌তে পারে নি। তাঁকে নিয়ে এমন জয়দেবী—চণ্ডীদাসী কীর্ত্তন আর কেউ কর্‌তে পারে নি। যমুনাই বল, আর সরযূই বল, বাঙ্গালীর ঘরের কাছে ভাগীরথীর কূলে কৃষ্ণনামের জয়-ডঙ্কা যেমন করে বেজে উঠেছে, এমন আর কোথায়ও বাজে নি!

আমাদের চিত্তের সমস্ত রস কৃষ্ণনামে

ক'ল্লে সে তাঁকে তেমন ক'রে পাবে কেমন কোরে ? বাঙ্গালী এই অসাধ্য-সাধন কোরেছে— সে হীরা মণি কিছু চাই নি। মুক্তি, স্বর্গ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম এ সমস্তই ছেড়ে দিয়ে কেবলই তাঁকে চেয়েছে— সে তাঁর লীলাসঙ্গী হ'তে চেয়েছে—চৈতন্য-চরিতামৃত অদ্ভুত বলের সঙ্গে কয়েছে—"শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা"—বাঙ্গালী দৈব-লীলা দেখ্তে চায় নি, তাঁর নরলীলা দেখ্তে চেয়েছে, এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে সেই লীলাকে শ্রেষ্ঠ করে মেনে নিয়েছে। এইটি আমাদের বিশেষত্ব, ইহা আর কেউ কোথায়ও চায় নি। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য্য—প্রেমের এই পঞ্চ-প্রদীপ বাঙ্গালার মন্দিরেই সর্ব্বপ্রথম জ্বলে উঠেছে।

বাঙ্গালী "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হয়ে তবে এই জায়গাটায় এসে পৌঁছিয়েছে। যজ্ঞ,

অবতরণিকা

হোম, জপ, তপ কোরে হয়রাণ হোয়ে—বাড়ীতে শিশুর খেলা ও গোচারণের মাঠ দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই তত্ত্ব শিখ্‌তে পেরেছে। শিশু যখন মায়ের উপর একান্ত নির্ভর করে,—অনুগতা রমণী যখন প্রাণেশের আশায় দীপ জেলে বসে থাকে, ব্যথার ব্যথীকে কাছে পেলে দুজনে এ ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে যখন মনের কথা কয়, কিংবা মনের আনন্দে খেলা কর্‌তে থাকে, ভৃত্য যখন নিজের প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে প্রভুর কার্য্য কর্‌তে থাকে, বাঙ্গালী ভক্ত তখন সেইখানে গিয়ে বেদীর জমি তৈরি করে বল্লে 'এর চাইতে বড় মন্দির কি গির্জ্জে কেউ কখনও কর্‌তে পারে নি।' মা যখন হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ চোখে নিয়ে এসে—অপলক চোখে, সদ্যঃজাত শিশুকে দেখ্‌লেন—ভক্ত দাঁড়িয়ে বল্লে "কি চমৎকার! আমি তোমায় এমনি আনন্দে দেখ্‌বো, এর চাইতে

বড় কিছু নেই—এই প্রেম আমায় দাও।”
বাঙ্গালী ভগবানের জন্য পাথরের মঠ মন্দির তৈরী করলো না, মাধবীকুঞ্জের এক পাশে গলায় উত্তরীয় বাঁধা কৃষ্ণকে অপরাধীর মত দাঁড় করালো, এবং তাঁর চোখের জল দেখে সখী হয়ে তাঁকে টিট্‌কারী দিতে লাগ্‌লো। তারা বুঝালো, যিনি ব্রহ্মাণ্ডপতি, তিনি প্রেমিকের কাছে এমনই হয়ে যান—এত বড় কথা জগতে আর কেউ বল্‌তে সাহস করে নি।

যদি বল এ সকল পাওয়া কেবল মনের বিকার, এ কেউ পাই নি। পাওয়া অর্থ কি? সত্য ভেবে নিজের প্রাণে গ্রহণ করা। পাওয়া মানে যদি এই হয়, তবে কি বল্‌তে চাও, ন'দের মানুষটি পান নি? যদি বল—এ সকল পাগলামী, তা হ'লে সে পাগল জগৎ সংসারটা সংক্রমিত কল্লে কি ক'রে? রাস্তায় একটা

পাগল চল্লে কুকুরগুলি পর্য্যন্ত তাকে চিনে ফেলে। আর তাঁকে দেখে মস্ত বড়, নাস্তিক, পাষণ্ড, বৈদান্তিক, অঘোরপন্থী শাস্ত্র-টাস্ত্র যুক্তি ভুলে গেল কি ক'রে? তাঁর মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে কেঁদে ফেল্লে কেন? যে কিছু পেয়েছে—তাকে লোকে বুঝতে পারে। বড় জিনিষ পেলে চোখে মুখে ধরা পড়ে। যাদের কিছু নেই কেবল ভাণ আছে, তাদের রিক্ততা তখন নিজেদের কাছেই ধরা পড়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, মুক্তাটা শুক্তির রোগ, এ পাওয়াটা যদি তেমনই রোগ হয়, তবে মন্দ কি? স্বাস্থ্যের চেয়ে রোগটা যে ঢের বেশী মহার্ঘ্য। বাঙ্গালী ঐশ্বর্য্য দেখে ভোলে নি—তারা প্রাণের পুতুলী ও নয়নের মণি ক'রে কৃষ্ণকে দেখ্‌তে চেয়েছিল! রাজবেশ, রাজদণ্ড, সিংহাসন এ সকলের দিকে তারা দৃক্‌পাত করে নি। যিনি অসুর দৈত্যের টিকি ধরে

মেরেছেন—তাঁর কথা তারা অবজ্ঞার সহিত ছেড়ে দিয়ে গেছে। যিনি পায়ের ধূলো মাথায় ক'রে নিয়ে বাঁশীর সুরে মন ভোলাতে চেয়েছেন, তাঁর রাখালের ধড়াটী বাঙ্গালীর চোখে কোটী কোটী রাজ-পরিচ্ছদ হতে মহামূল্য হয়েছে। তাদের কাছে গগনস্পর্শী প্রাসাদের চেয়ে মাধবীকুঞ্জের একটী লতা বড় হয়ে উঠেছে এবং তারা মথুরার সমস্ত মুক্তার মালার চেয়ে ব্রজের পথের ধূলার বেশী দাম দিয়েছে।

আমি এই প্রসঙ্গে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের যে প্রভেদ তা বুঝাতে চেষ্টা করেছি। অলমিতি বিস্তরেণ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

চিত্রসূচী

রাখালের রাজগি

১

রাধা নাইতে যেয়ে কি শুনে এসেছেন, তিনি বিশাখার গলা জড়িয়ে ধোরে কেঁদেই আকুল। বিশাখা বারংবার জিজ্ঞাসা কচ্ছেন 'কি হয়েছে?' রাই ভেজা চুলে ব'সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছেন,—একবার মাত্র বল্লেন, "কি আর বল্‌বো! আমার মাথার সোণার সিঁথিটা যমুনায় পড়ে গেছে, আর কিছু বল্‌তে পারব না; আমার মাথায় বাজ পড়েছে!"

এর বেশী একটি কথাও নয়। কি হয়েছে—তা' বল্‌বার নয়, তা সইবার নয়।

এর মধ্যে কৃষ্ণ বাঁশী হাতে করে এসে উপস্থিত। তিনি রাধাকে দেখে বল্লেন, "ভেজা চুলে, ভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছ যে? আমি মথুরায় যাব—বিদায় নিতে এসেছি।"

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে দেখেন, রাধা তাঁর পায়ের নীচে অজ্ঞান হোয়ে পড়ে গেছেন।

তখন অনেক যত্ন ক'রে কৃষ্ণ তাঁর মূর্চ্ছা ভাঙ্গালেন। তিনি বল্লেন, "আমি ঠাট্টা করে বলেছি, আমি তোমায় ফেলে কোথায় যাব?"

এই কথা শুনে রাধা চোখ মুছে চাইলেন, তখন শোকে তার কথা বল্‌বার শক্তি নাই; নিজের হাত দুখানি দিয়ে কৃষ্ণের হাত চেপে ধরে মাথায় রাখ্‌লেন। কৃষ্ণ বুঝ্‌লেন, রাধা তাঁর মাথা ছুঁয়ে দিব্যি করতে বল্‌ছেন।

কৃষ্ণ বল্লেন, "আমি যাব না, তোমার মাথা ছুঁয়ে বল্‌ছি।"

"আমি যাব না, তোমার মাথা ছুঁয়ে বল্‌ছি।" ২ পৃষ্ঠা

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

রাধার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো। রং শুকোবার আগে রোদ্‌ পড়লে ছবিখানি যেমন উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে, সেই হাসি তাঁর মূর্ত্তিখানি তেমনি স্নিগ্ধ-দীপ্ত কোরে দেখালো। ভেজা কাপড়, ভেজা চুল ও ভেজা চোখে রাইএর রূপ বড় সুন্দর দেখাতে লাগ্‌লো।

রাধা বল্লেন, "তোমায় অনেক কথা বলেছি, কিন্তু সব কথা বলা হয়নি। অনেকবার দেখেছি; কিন্তু সাধ মিটিয়ে দেখা হয় নি। তোমার কথা কত শতবার শুনেছি, কিন্তু কাণের তৃপ্তি হয় নি। তুমি বো'স, আজ তোমায় বড় দুর্ল্লভ বলে মনে হচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমাকে এমন কোরে আর পাব না।"

কৃষ্ণ বল্লেন, "আমি কাল আস্‌বো, আজ যাই, কাল রাত্রে কুঞ্জে অভিসারে যেও।"

২

বীণার তারগুলি এঁটে রাখ, তারগুলি সুরে বেঁধে রাখ। পায়ের নূপুরে কাপড় জড়িয়ে রাখ, নীলাম্বরী খানি যাতে সোণার চুম্‌কি নাই, ভাল করে কুঁচিয়ে রাখ। সখীরা তৈরী হয়ে থাক, টগর-রজনী-গন্ধা-পারুল-চাঁপা দিয়ে মালা গেঁথে রাখ। কাল বড় আঁধার রাত আস্‌ছে, কাল চাঁদ উঠ্‌বে না, পথের কোন বিঘ্ন নাই, বন পথে চলে যাব, শত্রু হাস্‌বে না। ললিতা, বিশাখা, একবার এদিক পানে এস, কাল বঁধু নিজে অভিসারে যাবার নিমন্ত্রণ করে গেলেন। কত ভাগ্যি, তিনি আপনি' এসে যাবার কথা বলে গেলেন। কাল রাতের জন্য

ঘিয়ের বাতি, ধূপ অগুরুর গন্ধে সল্‌তে সুগন্ধি ক'রে জ্বেলে রাখ্‌তে হবে। যতক্ষণ তিনি না আস্‌বেন, আমাদের চোখের কালো তারাগুলি তাঁর পথের দিকে ভ্রমরের মত যেন উড়্‌তে থাক্‌বে! তোরা ভুলিস না সন্ধ্যে বেলা আমার খোঁপা বাঁধ্‌তে। যদি শেষ বেলায় ঘুমিয়ে পড়ি, তবে জাগিয়ে দিস্‌। কাপড় জড়ানো নূপুর পায়ে পরিয়ে দিস্‌,—তাতে একটুও শব্দ হবে না, নূপুর-ধ্বনি শুনে ভ্রমরেরা গুঞ্জন কর্‌তে আস্‌বে না। 'কে যায়', 'কে যায়', বলে লোক সব চম্‌কে উঠে দেখ্‌তে আস্‌বে না। আমরা নির্জ্জন পথে যাব—যে পথে কেউ চলে না,—সে পথে চল্‌ব, আমরা কানুর প্রেমের নিশান উড়িয়ে যাব—আমরা যমুনার ঢেউএর মত দর্পে চলে যাব, কার সাধ্যি বাধা দেয়!"

ললিতা বল্লে, "রাই তুই মেলাই বকে যাচ্ছিস্‌। পাগল হ'লি নাকি? কাল অভিসারে যাবি, তা তো

রোজই যাস্, একদিন আগে থেকে এত উৎসাহ হচ্ছে কেন? এমন উৎসাহ তো আর কোন দিন দেখি নি!"

রাই বল্লেন, "কবে কানু দয়া করে বলে যান 'কাল অভিসারে কুঞ্জে যেও।' অন্যদিন তো বাঁশীর সুরে ডেকে পাঠান, আজ যে নিজে এসে বলে গেলেন—উৎসাহ হবে না?"

পরদিন অক্রূরের রথ-ঘর্ঘর শব্দে ব্রজবাসীরা চম্‌কে উঠ্‌লেন, রামকানুকে অক্রূর মথুরায় নিয়ে যাচ্ছে! বেণু, শিঙ্গা, বাঁশী পড়ে রইল। রাজপুত্রেরা রাজবেশ পরে কংসের ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ দেখ্‌তে গেলেন।

৩

রাধা তোমার না আজ অভিসারের দিন! আজ রাধার ঘুম ভাঙ্গ্‌ছে না। একি ঘুম, না মূর্চ্ছা? আজ বড় দুর্দ্দিন, আজকার মতন দিন আর আসেনি। আজ তাঁর মূর্চ্ছা ভাঙ্গাতে বাঁশী বাজ্‌ছে না—বাঁশী আর বাজ্‌বে না।

সহচরীরা কাছে নাই। মূর্চ্ছিতাকে ফেলে রেখে তারা কৃষ্ণের রথের চাকার গতি থামাতে গেছে। আর কি ব'লে রাধার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাবে? কি বলে তাঁকে সান্ত্বনা দিবে? কৃষ্ণ চলে গেছেন, কোন কথা তাঁকে আর এসে বল্‌বে?

বিশাখা কি ছেড়ে থাক্‌তে পারে? সে এসে

মূর্চ্ছিতাকে ধরে তুলে কৃষ্ণ-নাম বলে চেতনা কল্লে।

রাধা জেগে উঠে বল্লেন, "অভিসারের বেশ কোথায়? কখন বা চুল আঁচ্‌ড়াবি কখন বা নূপুর পরাবি, কখন বা মালা গাঁথবি? আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম, তিনি বল্‌ছেন, 'আমি ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না', এই বল্‌ছেন, আর চোখের জল ফেল্‌ছেন। আমার বুক বিদীর্ণ হচ্ছিল, আমি কেবল বল্‌ছিলুম—'কে তোমায় আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে বল্‌ছে?' এই ব'লে তাঁকে বাহুতে জড়িয়ে আদর করবো, আর ঘুম ভেঙ্গে গেল! বাঁশী বুঝি ডাক্‌ছে, —চল্ বেশ-ভূষার জন্য দেরী ক'রে কাজ নেই, চল রাজ পথ দিয়ে, আর ভয় কর্‌বো না। কৃষ্ণকে ভালবেসে ভয় কর্‌ব কাকে? ননদীকে ভয় কর্‌বো? সে যদি বলে তবে বল্‌ব, ননদী তুই এই বড় নগরটার সবখানে বলে বেড়াগে আমি কানুর প্রেম-

সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি। চল্ ললিতা,—কই চিত্রা, সুদেবী তারা সব কোথায়? তারা যদি না যায়, তবে আমি একাই যাব, তিনি যে বলে গেছেন— আজ অভিসারে যেতে, তার কথাতো আমার কাছে বেদের লেখা!”

৪

এই বলে রাই চল্লেন। চুলগুলি মুখের চারিদিকে পড়েছে। নীলাম্বরী সাড়ীর আধখানি ধূলোয় লুটুচ্ছে। চোখের কাজল অশ্রুতে মুছে গেছে। একটি অশ্রুবিন্দু পদ্মের উপর একটি ভ্রমরের ন্যায় গণ্ডের উপর এখনও আছে। চক্ষু পৃথিবীতে নেই, কোথায় কি দেখ্ছে কে জানে?

রাধা চলেছেন, বিশাখা তাঁর গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। মত্ত হস্তী পদ্ম বনের দিকে যাচ্ছিল, অঙ্কুশ হাতে নিয়ে যেন মাহুত পথ আগ্লে দাঁড়াল।

রাই দুর্ব্বল, কাল থেকে খাওয়া নেই, ঘুম নেই, জ্ঞান নেই। বিশাখা কেঁদে কেঁদে বাহু আকর্ষণ

কর্‌তে লাগ্‌লেন—রাই মূর্চ্ছিত হোয়ে মাটীতে পড়ে গেলেন,—ইট লেগে কপাল কেটে সিন্দূরের ফোঁটার সঙ্গে রক্ত মিশে গেল।

ওরে একদিন বাড়ীর পালঙ্কে বসে তোর মা কত চুমো খাচ্ছিলেন তোকে। তুই তখন তা জান্‌তিস্‌ না। যখন হাত পা নেড়ে খেলা কর্‌তিস—ছ'মাসের শিশু—তখন বাতি জ্বেলে তোর মুখ দেখে তোর মা আনন্দে সারা রাত্রি কাটিয়ে দিয়েছেন, নিজেকে আড়ালে রেখে মাকে দিয়ে তিনিই তো আদর স্নেহ দেখিয়েছিলেন। মা তো এখন স্বর্গে চলে গেছেন! এখন যে তুই পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছিস্‌, স্বর্গবাসীরা এখন তোকে আদর করা দূরে থাক্‌, ডেকেও জিজ্ঞাসা করেন না।

সেই সকল স্বর্গের পাওয়া আদরকে বিশ্বাস কোরো না, **তাঁর** মত ছলনা জানে এমন কেউ নেই—কেউ নেই। এক সময়ে মাথায় করে রাখ্‌বেন,

তারপর পায়ের নীচে ফেলে আছাড় মার্‌বেন এই তাঁর রীতি।

রাধা তুমি তার আদর দেখে ভুলেছিলে—সে যে মায়াবী! কাল আস্‌বে মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বলেছিল, মিথ্যাবাদী! তুমি নাইতে যেয়ে যা শুনেছিলে, তাই ঠিক্; তাকে বিশ্বাস করেছ—সে ভুল।

"আর যদি বিশ্বাস করে থাক, তবে বনে যেও না, কুঞ্জে যেও না, মনের ভিতর যাও; ঘিএর বাতি জ্বেলে কি দেখ্‌বে, ভক্তির বাতি জ্বেলে দে'খ—সহচরীদের নিও না। একা যেও, একা একা আরতি কোর—সেখানে গোলমাল নাই, কথা বল'না। আঁধারে খুঁজে খুঁজে তাকে পাও কি না দে'খ। লোকের কাছে জাহির হোয়ো না। নিজে খাঁটি থেকো, যা বাইরে কর্‌বার করো। লোকে যেন না বোঝে তুমি কোন্ পথের যাত্রী। তাদের মধ্যে

তাদেরই মতন হোয়ে থেকো, কিন্তু দিনরাত তাঁকে নিয়ে থেকো। রাধা তোমার প্রেমের ঐশ্বর্য্য সংবরণ কর তবেই মাথুরের নিগূঢ় রস পাবো।"

বড়াই এসে এই বলে গেলেন।

৫

রাই ঠোঁট বেঁকিয়ে বল্লেন—"এ সকল কি কথা ? এ হেঁয়ালী ছন্দ বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, বুঝ্‌তে চাই না।"

"বড়াই, তোমার সঙ্গে যেয়ে প্রথম দেখা হোয়েছিল, বলে দাও আবার দেখা হবে কিনা ?"

"সে বলে গেছে অভিসারে যেতে, আমি রোজ রোজ অভিসারে যাব। রোজ যেয়ে কুঞ্জ সাজিয়ে প্রতীক্ষা করে রইব। হয়ত কোন দিন তাঁর নূপুরের রুণুঝুণু শোনা যাবে ! হয়ত কোন দিন আরতির দীপ-শিখা আপনি জ্বলে উঠ্‌বে ; হয়ত কোন দিন এই পথ আমার প্রাণের মত তাঁর স্পর্শে জেগে

উঠে মাতালের মত ঘন ঘন আনন্দ-নিশ্বাস ফেল্‌তে থাকবে।”

“সে বলে গেছে কুঞ্জে মিলন হবে, সে কথা কি মিথ্যা হতে পারে? যে আশা জাগিয়ে গেছে, সে আশা পূরণের ভার তার উপর,—সে তা জানে, আমাকে কুঞ্জে যেতে বলে গেছে, আমি রোজ রোজ কুঞ্জে যেতে ভুল্‌ব না; সংসার ত আমার বাইরে, সংসারের কাজ তো আমার বাইরের কাজ—তা' ডিঙ্গিয়ে তা থেকে তাঁর পায়ের রেণু কুড়িয়ে পথের সম্বল কোরে আমাকে কুঞ্জের জন্য রোজ রোজ প্রস্তুত হতে হবে।”

৬

বিশাখা চিত্রা প্রভৃতি সখীরা বসে গল্প কচ্ছেন ; রঙ্গদেবী বল্লে, "কাল তো তুই ছিলি বিশাখা, কি রকম করে রাত কাটালে রাই ?"

বিশাখা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, "কাল যেন রাত আর কাটতে চায়নি।" রাই শেযে শুয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগলো, ধীরে ধীরে বল্লে—"শোন্ বিশাখা, আমি যদি মরে যাই,—আমি মরব না, কারণ আমি মোলে তাঁর বিরহ সইবে কে ?—কিন্তু যদিই মরি, তবে ঐ আমার সোণার হারটি মাধবী লতাটার উপর রইল—সে তো আসবেই বলে গেছে, এসে ঐ হারটি যেন একটিবার পরে।"

এই বলে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আর কিছু বল্‌তে পারলে না ; তার পর বীণাটি যেমন একটুখানি থেমে আবার বাজে সেইরূপ ভাবে বল্লে ঃ—

"বড় যত্ন করে আঙ্গিনায় মল্লিকা ফুলের চারা বুনেছি, তারা সবে বাড়্‌তে স্থরু করেছে। যখন গাছে ফুল হবে আমি তো তখন নাও থাক্‌তে পারি, তোরা সেই ফুলের মালা তাঁর গলায় দুলিয়ে দেখ্‌বি। আর আমি তখন এই ফুল শয্যার পার্শ্বে থাকি আর না থাকি, তাকে একবার আস্‌তে বলিস্‌।"

৭

এই বলে রাই কাঁদতে লাগলেন। "সে কান্না কি বলে থামাব ?"

সুদেবী বল্লেন, "এ সকল কথা আর শুন্‌তে পারি না, ব্রজলীলা ফুরিয়েছে, আমাদের বেঁচে থেকে আর দরকার কি ? কেবল রাইএর জন্য মর্‌তে পাচ্ছি না ; সে বলে—তিনি বলে গেছেন কুঞ্জে যেতে, তাঁর কথার মান না রেখে যদি মরে গিয়ে তাঁকে না পাই ! এ প্রাণ তাঁকে দিয়েছি, তাঁর প্রতীক্ষা না কোরে সখ্ ক'রে তো নিজে নিজে তাঁর জিনিষ ফেলে দিতে পারি না।"

তাঁরা এই বল্‌তে বল্‌তে বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে

ঘুর্‌তে লাগ্‌লেন। তুঙ্গদেবী বল্লেন—"এই ত সেই জায়গাটা। এখানে একটা ধনুকের মত দাগ এখনও রয়েছে। ,এখানে কৃষ্ণ রাইকে নাচ্‌তে বলেছিলেন "চোখের পলক্ পড়্‌বে না, দ্রুত নেচে যাবে। এত দ্রুত নাচ্‌বে যে তোমার নীলাম্বরীর আঁচল নড়্‌বে না, —এত দ্রুত নাচ্‌বে যে তোমার পায়ে নূপুরের শব্দ হবে না,—তোমার এলো-চুল উড়্‌বে না, হাতের কাঁকন বাজ্‌বে না। এই ধনুর মত চিহ্নিত জায়গার গণ্ডী ছেড়ে যেন পা না পড়ে, যদি এমনই করে নাচ্‌তে পার, রাই, তবে আমার বাঁশীটি বাজি রইল। যদি হেরে যাও, তোমার কাঁচুলী ও গলার হার কেড়ে নিব।"

রাই সেদিন কি সুন্দর নেচেছিলেন—অতি গতিতে মাথার চুল হোতে পায়ের নূপুর পর্য্যন্ত সব স্থির হোয়ে গেছিল।

বাঁশী নিয়ে কানু আস্তে আস্তে পথের দিকে

রওনা হোচ্ছিলেন—ললিতা খপ্ করে বাঁশী শুদ্ধ হাত ধরে ফেল্লে, তখন তার জলে ভরা ছল ছল চোখ দুটির দিকে চেয়ে হাস্তে হাস্তে রাই বল্লেন, "ললিতা বাঁশী নিয়ে কাড়া কাড়ি কচ্ছিস কেন, বাঁশীতে 'রাই এস' না শুন্লে কি আমি আর বাঁচব? হেরেও ওঁরই জিৎ।"

"খপ্ করে বাঁশীশুদ্ধ হাত ধরে ফেল্লে।" ২০ পৃষ্ঠা

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

৮

রঙ্গদেবী বল্লেন, "এই যে গোবর্দ্ধন-গিরি, শিলা-তল বড় নির্জ্জন স্থান ; মথুরা যাবার চার দিন আগে এইখানে দুপুর বেলা রাইকে পেয়ে কত সুখী যে হোয়েছিলেন তা আর কি বলব। রাই এই পীত-বাস পরে মনে হয় তোমার বর্ণ দিয়ে আমার গা ঢেকে ফেলেছি,—তোমার নামে সাধা বাঁশী, তাই এক দণ্ড আমি এটি হাত ছাড়া করতে পারি না। দিন রাত তোমার পায়ের ধূলি পাবার গরবে আমার মাথার চূড়া হেলে থাকে।"

এই বলে কত আদরে রাধার পা ছুঁতে গেলেন। 'কি কর' বলে রাই পা সরিয়ে নিচ্ছেন,—আর কানু বল্‌ছেন—'ঐ পা ছুঁলে মনে হয় যেন আমি জীবন পাচ্ছি।'

সেই মানুষ কি হয়ে গেল।"

৯

মাঘ মাসে কৃষ্ণ মথুরায় গেছেন, তাঁর স্পর্শ না পেয়ে দুরন্ত শীত রাত্রি রাই ব'সে ব'সে কাটিয়েছেন। সে মাসে একটি রাতও তিনি ঘুমোন নি।

ফাল্গুন মাসে দোলমঞ্চে কার সঙ্গে দুল্‌বেন! কার নীল পদ্মের মত মুখখানি, পীতধড়া ও ময়ূরের পাখা আবিরে লাল হয়ে উঠ্‌বে! কার গায়ে কুঙ্কুম ছুড়ে মেরে তা' রাঙ্গিয়ে দেবেন!

চৈত্র মাসে রাই যমুনার যে পথে নাইতে যেতেন, সে পথে জল ঢেলে কানু শীতল ক'রে রাখতেন। দুপুরে পসরা নিয়ে যাওয়ার সময় হাত জোড় করে এসে বল্‌তেন, "এই দুপুর বেলা পথের ধূলো

"দোলমঞ্চে কার সঙ্গে দুল্‌বেন!" ২২ পৃষ্ঠা

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

তেতে উঠেছে; তুমি এই কদম গাছের নীচে খানিকটা এসে বিশ্রাম কর, পথে আস্‌তে বড় ব্যথা পেয়েছ।” তার পর রাই বস্‌লে কৌতুক করে বল্‌তেন, “কত মণি মুক্তো তোমার গায়ে ঝল্‌ মল্‌ কচ্ছে। ব্রজের আহিরেরা দিন দুপুরে ডাকাতি করে, তুমি কোন সাহসে বার হয়েছ? এইখানে আমার কাছে থাক। তোমার মুখখানি পদ্মের মত, কি জানি যদি ভ্রমরের দল ফুল ভেবে দংশন করে, তুমি এইখানে আমার কাছে থাক।”

তার পর দানী সেজে রাইএর উপর কত কৌতুকের জুলুম করেছেন, ‘দান দাও বলে’ পথ আগ্‌লে হাত পেতেছেন; সে সকল দিনের কথা স্মরণ করে রাইএর চৈত্র মাস কি করে কাট্‌বে?

বৈশাখ মাসের কোকিলের ডাকের সঙ্গে কানুর বাঁশী এক হয়ে বাজ্‌ত; দখিণা হাওয়ায় তার পীত-ধড়ার সোণার রেণু বয়ে নিয়ে আস্‌তো। কত ফুল

তুলে তিনি রোজ রোজ রাইকে উপহার দিতেন!
'যে দিকে চোখ ফিরিয়েছি—সেই দিকেই ফুলে
ফলে আকাশের রঙ্গে, বাতাসের মধুর স্পর্শে তাঁরই
দয়া, তাঁরই প্রেম পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হোয়ে
গেছি। এই নূতন বর্ষের নূতন খাতায় আজ সব
জায়গায় শূন্য পড়েছে।'

জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃন্দাবনের সব ফুল সূর্য্যের কিরণ
গায়ে মেখে ফুটে উঠ্‌তো। তিনি ফুলশয্যা তৈরী
করে রাইএর জন্য বসে থাক্‌তেন। যমুনার এ ঘাটে
রাই নাইতেন, ও ঘাট হোতে তিনি অঞ্জলি অঞ্জলি
জল নিয়ে তার মধ্যে রাইএর গায়ের শ্বেত-চন্দনের
রেণু ও কুঙ্কুমের লাল রঙ্গ দেখে, আনন্দে চোখের
জল ফেল্‌তেন। কুটিলা ননদী এসে বল্‌তো—'বউ
তুমি কি আজ সারা দিন জলে থাক্‌বে।' কানু
কদম গাছে উঠে পাতার আড়াল থেকে ননদীর
সঙ্গে রাধার কথাবার্ত্তার মধ্যে চোখের ইসারা কোরে

তার কথার খেই ভুলিয়ে দিতেন। 'আমি তো তখন দুঃখ জানতুম না ; হে কৃষ্ণ তোমার প্রেমের ছায়ায় আমার জ্যৈষ্ঠ মাস শীতল হোয়ে থাক্‌তো, ননদীর কথার তাপ আমার গায়ে লাগ্‌ত না। অক্রূর এসে আমার সেই তরুণ শীতল ছায়া হরণ করে নিয়ে গেল, আমি কোথায় জুড়োব ?'

আষাঢ় মাসে নূতন মেঘের উপর রামধনু দেখে, আমি কুঞ্জে তোমাকে দেখবার জন্য উতলা হোয়ে থাক্‌তেম ; ময়ূর ময়ূরী মেঘ দেখে নেচে উঠ্‌তো। তুমি এসে আমার কত সোহাগ করে নূপুর পায়ে নাচ্‌তে বল্‌তে ; সে আষাঢ়ের আশা ফুরিয়েছে।

শ্রাবণের রিমি ঝিমি বৃষ্টিতে রজনীগন্ধ ফুটত, সন্ধ্যা মালতীর রং আরও লাল হোতো। তুমি সেগুলি আমার কাণে গলে পরিয়ে দিতে, এত শীঘ্রির আমার সব সুখ ফুরোবে তাত জানতুম না।'

কানু, ভাদ্র মাসে বৃষ্টিতে ভিজে আমার সঙ্কেত

শুনে চোরের মত অপেক্ষা করতে ! কত কষ্ট তোমায় দিয়েছি ! আমার ঘরে গুরুজন জেগে থাক্‌তেন, আমি তোমাকে ডেকে এনে বস্‌তে একটু জায়গা দিতে পারিনি। সে সকল দিনের কথা শেলের মত বুকে বিঁধে আছে ! সংসার আমায় ঘিরে রেখেছিল, তোমার কাছ যাব বল্লেই কি যেতে পারি ! আমি স্ত্রীলোক, তুমি কি জান না, মনের কথা মনে রয়েছে, তোমায় বল্‌তে পারিনি। চোখ দুটি পেয়েছি, কিন্তু চোখ তুলে তোমায় দেখবার অবসর পাইনি। গোঠে যেতে, তোমার বাঁশী শুনে পাগল হয়ে জানালার দিকে চেয়ে থাক্‌তুম, কিন্তু দাদা বলাই সঙ্গে থাকতেন —আমি চোখ চেয়ে দেখ্‌তে পেতুম না—লজ্জায় নত চোখে ফিরে যেতুম, তুমি কি সে কষ্ট বোঝনি ? এই দুখানি পা কত বৃথা কাজে কত জায়গায় গেছে —তোমার তীর্থে ত যেতে পারে নি ! আজ আমার শেষ। আজ ভাব্‌ছি, কেন তোমায় ছেড়ে, কোন্

লজ্জায়, কার ভয়ে, কার আশায় এখানে সেখানে ঘুরেছি? কেন তোমার পা' আঁকড়ে ধ'রে—আর সমস্ত যমুনায় ভাসিয়ে দেই নি। আজ এই ভরা ভাদ্র মাস, যমুনায় বান ডেকেছে, কে আমায় ওপারে নিয়ে যাবে, আমি ওপারে তোমার কাছে কেমন করে যাব? আমি সাঁতার জানি না, হে মাঝি, তুমি পার না কল্লে, আমি নিজে কি ক'রে পার হ'ব? আমার ভাঙ্গা না, মদারের বৈঠা, আজ আমায় কে পার করবে? আজ এ ভাদ্রের বন্যায় আমি ভেসে যাচ্ছি। ভাদ্রে তোমার জন্মোৎসব, বৃন্দাবন আনন্দে ভেসে যেত, আজ আর কি উৎসব করবো। আমাদের চোখের জলের অর্ঘ্য ছাড়া উৎসব কি আছে!

আশ্বিন মাসের উৎসব বৃথা হোয়ে গেছে, আর কাকে নিয়ে উৎসব করব? আর কোন সখী তোমার আগমনী গান করবে! আমার পক্ষে যে বিজয়া হোয়ে গেছে।

কার্ত্তিক মাসও চলে গেল ; কার্ত্তিক পূর্ণিমার রাসে গোপীরা তাঁকে ঘিরে দই ও হরিদ্রা দিয়ে খেল্‌তেন্! শ্যাম অঙ্গে কুঙ্কুম ছিটাতেন,—কার্ত্তিকের হিমের রাত্রি রাই বসে তাই ভেবে ভেবে কাটালেন। হিমে পদ্ম-দল শুকিয়ে গেল, রাই্ও সেইরূপ হোলেন! শরৎ কেটে গেছে, বর্ষার মেঘের শেষ সুর শুনিয়ে, বনে বনে রোদের সোণালী রঙ্গ ঢেলে শরৎ চলে গেছে, চাঁদকে কোয়াসায় ঘিরেছে ; রাই উন্মনা হোয়ে থাকেন—কারু সঙ্গে কথা কন না, হিমকণার সঙ্গে তার অশ্রুকণা মিশে যায়।

অগ্রহায়ণে নবান্ন ; কার ভোগের জন্য পিষ্টকাদি নিবেদন ক'রে রাই প্রসাদ পাবেন ?

পৌষের শীতকে উষ্ণ স্পর্শ দিয়ে কে ভেঙ্গে দিবে ?

১০

প্রত্যেক দিন তার প্রেমের কথা স্মরণ হয়, ষড় ঋতুর প্রত্যেকটিতে তার প্রীতির ছাপ পড়েছে। এখন সেগুলি চিহ্ন মাত্র হয়ে আছে। পৃথিবীকে তারই পাদপদ্মের দাগ মনে করে, রাই মাটীতে লুটিয়ে পড়্লেন, এই ধূলোতে তার পদধূলির রেণু আছে, এই বলে লুটিয়ে পড়্লেন—আহার গেছে, নিদ্রা গেছে, এইবার প্রাণও বুঝি যায়।

সখীরা কত বুঝান! কিন্তু কে বুঝ্বে? মেঘের গুরু গুরু শব্দ, কদম্বের ঘ্রাণ, পাপিয়ার পিউ পিউ ও বিদ্যুতের ঝলক্—রাইকে কি সংবাদ দিয়ে যায়, আহার নিদ্রা ছেড়ে তিনি তাই শুনেন ও মাঝে মাঝে চম্‌কে উঠে প্রলাপ বক্‌তে থাকেন।

রাখালের রাজগি

একদিন রঙ্গ বিশাখাকে বল্লেন, "তুই তো নন্দ-গ্রামে গেছিলি, তাদের অবস্থা কি দেখ্‌লি ?"

বিশাখা বল্লে, "সে সকল বলে কি হবে ভাই, একবার নন্দালয়ে যেয়ে ছাখ্‌ না ; দুই জনে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হোয়ে গেছেন,—রাখালেরা যখন মনোদুঃখে, ধেনুর পাল নিয়ে তাঁদের বাড়ীর কাছ দিয়ে চলে যায়, তখন তাঁরা চোখে দেখ্‌তে পান্‌ না, তাদের পায়ের নূপুরের শব্দে নন্দ বুঝ্‌তে পারেন—গোচারণের সময় হোয়েছে, তখন তাদের ডেকে আনেন, কাছে এলে মুখে হাত বুলায়ে বলেন, 'কে শ্রীদাম নাকিরে, না সুদাম ?' সেদিন কাঁদতে কাঁদতে মধুমঙ্গল বলে—'আমি শ্রীদাম নই, আমি আপনার মধু।"

"মধু, তুই আমার গরুগুলি নিয়ে যা'—তারা কিছু খায় না। সেই হোতে উর্দ্ধমুখে মথুরার দিকে চেয়ে আছে।"

"মা বাপকেও কি এমনই করতে আছে? আমরা কি বলবো!"

এ সময়ে হেলতে দুলতে ম্লানমুখে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বৃন্দা সেখানে উপস্থিত হোল। বিশাখা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধল্লে।

বৃন্দা বল্লে, "এই আমি রাইএর কাছ থেকে আসছি,—উঃ কি দাবানলেই বৃন্দাবন দগ্ধ হোয়ে গেছে! ভ্রমর উড়ছে না, ফুল ফুটছে না—বাঁশী বাজছে না! হা বিধাতা, কি বৃন্দাবন দেখিয়েছিলে, আর কি বৃন্দাবন দেখাচ্ছ! এখানে কত বকাসুর অঘাসুর কিছু করতে পারে নি, তা কিন্তু কৃষ্ণ-বিরহ একে ধ্বংস করে গেছে।

"রাইকে দেখলুম সে উঠতে পাচ্ছে না, বহুকষ্টে একবার শুয়ে পড়েন, আবার মাটী ধোরে উঠে বসেন, ব্যাকুল চোখে চারিদিকে চান,—আর চোখ দিয়ে কেবল অশ্রু পড়তে থাকে, সেখানে

রূপমঞ্জরী ও গুণচূড়া বসে আছে; সেখানে একটু দাঁড়িয়েছিলুম --তখন যেন মনে হোল কৃষ্ণ সত্যিই বৃন্দাবন ছেড়ে গেছেন। তাঁর অভাব তেমন্ কোরে আর কোথাও মনে হয় নি।"

রঙ্গদেবী মিনতির সুরে বল্লে, "তুমিই হচ্ছ, আমাদের বল বুদ্ধি। এখন উপায় কি, তুমি কি একবার মথুরায় যাবে না।"

বৃন্দা বল্লে—"তা আমি রাইকে সেই আশ্বাস দিয়ে এসেছি! আমি কালই যাচ্ছি!"

সকল সখীর মিনতি প্রীতি ও নমস্কার সহ শুভ-দৃষ্টি বৃন্দার মাথার উপর যেন পুষ্প বর্ষণ কর্‌তে লাগল।

১২

পরদিন সন্ধ্যায় বৃন্দা মথুরায় যাত্রা কল্লেন। ব্রজগোপীরা দীপ জ্বালিয়ে যমুনায় ভাসিয়ে দিয়ে বল্লে, "দূতি, দেখ যেন আমাদের এই শত শত আশার দীপ নিবে না যায়!"

শত শত চোখের জ্যোতিতে বৃন্দা পথ দেখ্‌তে পেল। তারা যেন বৃন্দার পথ তাদের চাউনির নীল-পদ্ম ছড়িয়ে কোমল করে দিল।

আজ বহুদিনের পর সন্ধ্যায় গোপীদের মুখে শাঁখ বেজে উঠ্‌ল; বড় আশায় বেজে উঠ্‌ল। "আর কি ব্রজের শ্রী ফিরে আস্‌বে? বৃন্দা! তুমি কি আন্‌তে পার্‌বে?"

বৃন্দা বলে গেল, "আন্‌বে তো তোমরা। আমি তো একটা উপলক্ষ মাত্র। তোমাদের সর্ব্বস্ব দেওয়া ভালবাসার আকর্ষণ যদি না টেনে আন্‌তে পারে, তবে আমি কি কর্‌ব ভাই! তোমাদের বলে আমি যাচ্ছি। আর একজন, যে জীবন ছেড়ে দিয়ে প্রেমের তপস্যা করছে, যদি আন্‌তে হয় সে আন্‌বে—আমি তার দূতি হয়ে চল্লুম।"

সেই সন্ধ্যায়—নীলাম্বরী পরে অভিসারিকার মত বৃন্দা চলে গেল; সমস্ত বৃন্দাবন যেন এক দৃষ্টে একাগ্র হোয়ে তার পথের পানে চেয়ে রইল।

১৩

এত বৃন্দাবন নয়,—এ যে মথুরা। এখানে বড় বড় অট্টালিকা,—একটা ফুল বা লতা ওতো দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। নগরের বুক পাষাণে চাপা। এখানে প্রভাতে পদ্ম ফুটে ওঠে না। বড় বড় বাড়ীর আড়াল থেকে সূর্য্যোদয় দেখা যায় না। পাখী কলরব করে না। শেষ রাত্রে 'দয়েল,' 'চোখ গেল' ডেকে ওঠে না; রাত্রি যে পুহিয়ে যায়—তা বুঝ্‌ব কি করে?

বৃন্দা শুন্‌লে—ঢং ঢং করে নগরের কাণের কাছে প্রভাতী ঘণ্টার শব্দ যেন ধাক্কা মেরে সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে গেল।

রাখালের রাজগি

কই রাখালদের বাঁশীর সুর কই? মায়েরা ছেলেদের চোখে কাজল পরান্ কই? কপালে অলকা তিলকা এঁকে দেন কই? বউএরা কলসী নিয়ে নূপুর বাজিয়ে জল আন্‌তে যান কই? পুকুরের জলে পদ্মের মত সুন্দর মুখ ফুটে ওঠে কই? কোমল হাতের চুড়ি-বালায় লেগে বাসনের ঠুন্ ঠুন্ শব্দ ঘাটে ঘাটে ভ্রমরের মত গুঞ্জন করে কই? মেঠো সুরে আকাশ কাঁপিয়ে চাষী হাল বায় কই?

১৪

বুন্দা দেখলে, সোণার লাঠিহাতে দারোয়ান উটের পিঠে বসে যাচ্ছে। সম্মুখভাগে সোণা রূপার হাওদায় মুকুট-পরা বড় লোকেরা যাচ্ছেন। হাতীতে রথ টান্‌ছে, রাজপথে রাজরাজ্‌ড়ারা যাচ্ছেন—মস্ত মস্ত বাড়ীর দরজার সম্মুখে লাল রেশমী বস্ত্র-পরা খাঁড়া হাতে চওড়া গোঁপওয়ালা লম্বা সেপাই নাগ্‌রা জুতো পায়ে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। রাস্তায় যারা যাচ্ছেন, তারা হেঁটে যাচ্ছেন কি ছুটে যাচ্ছেন, তা বোঝা যায় না। সবাই ব্যস্ত—সবাই ক্ষিপ্রগতি—যেন একদণ্ড দেরী সয় না,—এইভাবে চল্‌ছেন। কত পুষ্প-রথ, কত শকট, কত রঙ্গের কাঁচুলী গায়ে বাঁকা

মল-পরা, নানা রঙ্গের ডুরে শাড়ী ও ওড়না দিয়ে গা' ঢেকে মথুরাবাসিনীরা, পুরুষদের মত, পুরুষদের গা ঘেঁসে চলে যাচ্ছে। তাদের সইএ সইএ সে গলাগলি ভাব কোথায়? সেই থম্‌কে থম্‌কে, 'লজ্জিত চোখের কোণে পথিককে দেখে সশঙ্কিত' হোয়ে চোখ নত করা, সে মৃদু-মধুর ভাবে যাওয়ার ভঙ্গী কোথায়? বড় মানুষেরা শাল দোশালা গায়ে, রত্ন-খচিত পাগ্‌ড়ী মাথায়, জরীর জুতা পায়ে চলেছেন। তাঁদের গা ঘেঁসে তাঁদের গ্রাহ্য না কোরে মুটে মজুর চলে যাচ্ছে।

এ সব কেমন! এই সকল বড় লোকের এক জন বৃন্দাবনে গেলে যে শত শত চোখ দূর হোতে বিস্ময়ে চেয়ে দেখ্‌তো; এদের কেউ দেখ্‌ছে না, কেউ মান্‌ছে না। কেবল হৈ হৈ চীৎকার, শকটের শব্দ! বৃন্দা রাস্তায় চল্‌তে ভয় পেতে লাগ্‌লেন। "কানু এই মথুরায় রাজা হোয়েছে! তাকে কোথায়

গেলে পাব? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করা যায়! যারা পথ হাঁট্ছে, তাদের যেন অবসর মাত্র নেই— এমনই ভাবে ছুটে যাচ্ছে। তাদের আমি কেমন করে জিজ্ঞাসা কর্তে পারি।"

সখীদের মধ্যে বৃন্দার মত মুখরা তো কেউ নয়, কিন্তু আজ তার সমস্ত কথা কইবার শক্তি যেন কে হরণ করে নিয়ে গেল। তার তালু ও জিহ্বা যেন শুকিয়ে কাঠ হোয়ে গেল।

১৫

বৃন্দা দেখ্‌ল এক স্থানে একটা প্রমোদ উদ্যানের মত ; তার ধারে ধারে টবে ফুলের চারা বসানো। এ কি কৃষ্ণকেলী নয় ? ঠিক তাই তো।

বৃন্দা যেন এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। এই বৃহৎ পুরীর মধ্যে—অপরিচিত রাজ্যটার মধ্যে সেই ফুল-গুলি যেন একমাত্র পরিচিত বন্ধু। এই রকম ফুল ত বৃন্দাবনেও আছে। তার পরে চোখে জল এলো ; হায় ! বৃন্দাবনে কি আর ফুল ফোটে ? যাঁর গায়ের হাওয়ার স্পর্শে গোপীর প্রাণ আর ফুলের পাপ্‌ড়ি ফুট্‌তো,—সে বৃন্দাবন-ভানু যে আজ মথুরায় !

প্রমোদ উত্থানে অনেক লোক ঘুরে ঘুরে কথা-বার্ত্তা কইছে। কেউ কেউ বা বড় বড় মর্ম্মর পাথরের আসনের উপর বসে বিশ্রাম কচ্ছে। এই একটু জায়গায় যেন তেমন তাড়াহুড়া নেই।

বৃন্দা দেখ্‌লে, দুইটী বুড়ো লোক লাঠি হাতে কি কথা কয়ে ধীরে ধীরে পা'চারি কচ্ছেন।

কই কেউ তো তাকে কিছু জিজ্ঞাসা কচ্ছে না—বৃন্দাবনে নূতন লোক গেলে তাকে কত কৈফিয়ৎ দিতে হয়, জনে জনে তার চৌদ্দ পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করে ছাড়ে। অতিথি ভেবে লোকে তাকে কত টানাটানি করে। 'আমাদের বাড়ী এস' বলে জড়িয়ে ধরে ছেলেরা বাড়ী বাড়ী তাকে নিয়ে যাবার জন্য কত আদর করে। এখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক—আমি যে কাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তাই ঠিক পাচ্ছি না। এ জায়গা কেমন ভাল লাগ্‌ছে, আবার ভালও লাগ্‌ছে না; চারিদিকে

চমৎকার বাড়ী, ঘর, রাস্তায় কি আশ্চর্য্য ঘটা, কিন্তু কেন যেন প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে। এত বড় সহরটায় আপনার জন কেউ নাই ; এরা যেরূপ কাজে ব্যস্ত, এরা কি কাজ ফেলে মনের কথা বল্‌বার অবসর পায় ? এখানে সকলেই নজেদের ' নিজেদের— কেউ পরের নয়।

তখন বৃন্দার বুকটা হঠাৎ ধড়াস্‌ করে কেঁপে উঠ্‌ল, 'এখানে আপনার জন নেই কে বল্লে ; এখানে যে আমাদের কানু আছে।'

বৃন্দার চোখ গড়িয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

১৬

সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালা ও গাড়োয়ান নানারূপ হেঁকে যাচ্ছে। ঝাড়ু বরদার রাস্তা ঝাঁট্ দিচ্ছে। মালীরা রাস্তায় চন্দন ছড়াচ্ছে। যেদিক দিয়ে মথুরার রাজপুরী—সেই পথে তারা বোঁটা ছেঁড়া ফুল ছড়িয়ে যাচ্ছে।

সেই রাজপথের অফুরন্ত ছবি থেকে মুখ ফিরিয়ে বৃন্দা দেখ্‌লেন, সেই দুইটি বুড়ো মাথায় মস্ত বড় পাগ্‌ড়ী, রেশমী লালপেড়ে কাপড় পরা, কপালে রুলি,—ঘাড় নেড়ে নেড়ে কথা বল্‌তে বল্‌তে তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

বৃন্দা খুব সাহস কোরে তাঁদের একজনকে

জিজ্ঞাসা কল্লেন—"মথুরার রাজপুরীটা কোন্‌দিকে বাবা ?"

তাঁদের একজন একটু বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়ে বল্লেন, "নূতন এসেছ বুঝি বাছা, তাইতো পাড়া-গেঁয়ে ঢঙ্গে সাড়ী পরেছ, দেখ্‌ছি। ওই যে ডানদিকের পথে একটা লোক ফুল ছড়িয়ে যাচ্ছে ও বড় একখানা রথ একটা শকটের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গেল, ঐ পথটা দিয়ে সোজা খানিকটা গেলেই রাজপুরী ; তা কাউকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে না। অত বড় লাল পাথরের বাড়ী মথুরায় নেই ; কংস বিশ্বকর্ম্মাকে ডেকে তৈরী করেছিল, সাম্‌নে নীল লাল পাথরের কাজ করা প্রকাণ্ড সিংহদ্বার—তার উপর ১০১টা সোণার কল্‌সী।"

১৭

এই বলে বুড়ো চলে গেলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তার কোন্‌খানে থাকেন, তা ত জানা চাই!

বৃন্দা দেখ্‌লেন, বুড়ো দুটি যেয়ে মর্ম্মর পাথরের একটা মঞ্চে হেলান দিয়ে আবার ঘাড় নেড়ে গল্প কর্‌তে লেগে গেছেন।

তিনি আস্তে আস্তে যেয়ে সেই দুই বুড়োর যিনি তাঁর সঙ্গে কথা ব'লেছিলেন ও যাঁর পাগ্‌ড়ীর রংটী নীল তাঁকে বল্লেন—"বাবা, সেখানে কি কৃষ্ণ থাকেন ?"

বুড়ো চম্‌কে উঠে বল্লেন, "মথুরা-রাজ! তাঁর খবর আমরা কি জানি? তিনি অবশ্য রাজপুরীতেই আছেন।"

বৃন্দা জিজ্ঞাসা কল্লেন, "রাজপুরীতে কি গোচারণের মাঠ আছে?" বুড়োরা কিছুই বুঝিতে পাল্লেন না, এ ওর মুখের দিকে চাওয়া-চায়ি করে, এক-জন হেসে বল্লেন, "তুমি রাজপুরীতে কাকে চাও?"

"আমি মথুরাধিপের সঙ্গে দেখা করব।"

১৮

"**তাঁর** খবর তো বাছা আমরা কিছু বল্‌তে পার্‌ব না। গন্ধর্ব্ব-রাজ স্বয়ং এসে দু'দিন থেকে চলে গেছেন। কংসবধ শুনে স্বয়ং কুবের কৌস্তুভ-মণি নিয়ে ভেট দিয়ে গেছেন। কিন্তু এঁদের কারু সঙ্গে মথুরাধিপ দেখা করেন নি!

"শুনেছি সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা এসে একদণ্ড দেখা কর্‌তে অনুমতি পেয়ে ছিলেন এবং সেই সুযোগে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর পিছু পিছু যেয়ে দেখা করে গেছেন। কিন্তু তার ঐরাবতটা নিয়ে ভারি গোল বেঁধেছিল। মথুরার রাজদ্বারী মস্ত বড় বলে সেটাকে কিছুতেই পুরীর পথে ঢুকতে দেয় নি; দেবরাজকে অনেকটা পথ হাঁট্‌তে হোয়েছিল।

"কংসবধের খবর পেয়ে লোকপালেরা এসে হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে যাচ্ছেন। কনোজ, কাশ্মীর, দ্বারাবতী প্রভৃতি দেশের রাজারা এখনও পুরীতে এসে এত্তালা দিয়ে আছেন—তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি।"

হলুদ রঙের পাগ্ড়ী মাথায় বুড়োটি বল্লেন, "ভাই কলিঙ্গরাজ রজতসিং খুব সহজে সেরে নিয়েছেন। অগস্ত্য ঋষি মথুরেশকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছিলেন, রাজা তাঁকে খুব সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সঙ্গে নেওয়ার জন্য আবদার করেন। অগস্ত্য ঋষির ভ্রাতুষ্পুত্র পরাশর হচ্ছে কিনা কলিঙ্গরাজের মন্ত্রগুরু। তারই খাতিরে ঋষি রজতসিংহের সঙ্গে মথুরেশের দেখা ঘটিয়ে দিয়েছেন। শুনেছি নাকি দুটো শ্বেত হাতী দিয়ে টেনে একটা সোণার ছোট বাড়ী রাজা মথুরেশকে ভেট দিতে এনেছেন। সেই বাড়ীটার এক-এক ঘরে কত হীরে-মাণিক, কত

জহরৎ, কত সোণার আসবাব্ !”

দ্বিতীয় বুড়োটি বল্লেন, “ভেট তো আস্‌ছেই, বর্ষার বানের মত আস্‌ছে ; কিন্তু মথুরেশের সঙ্গে দেখা পাবার উপায় কি ? রাজারা সিংহদ্বারের নিকট ভিড় কচ্ছেন ও সাত্যকির হাতে সোণার চাবুক খেয়ে ফিরে যাচ্ছেন।”

১৯

প্রথম বুড়ো বল্লেন, "কংসের ভয়ে প্রজারা সশঙ্কিত ছিল ; ঋষিরা মথুরার চৌকাঠ ডিঙ্গোতেন না—কেবল নারদ মাঝে মাঝে আস্‌তেন।

"তাঁকে যে দিন মথুরেশ বধ করেন, সেই দিন থেকে তো রাজ্যের ভয় ও আপদ দূর হোয়েছে—সব্বাই তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায় ; কিন্তু এমন ভাগ্যি কার—যে দেখা পাবে ?"

এমন সময় বৃন্দা বাধা দিয়ে বল্লেন, "আপনারা মথুরেশ ব'লে যাঁর কথা ক'চ্ছেন, তিনিই তো কৃষ্ণ ?"

বুড়োদের একজন বল্লেন, "তুমি পাড়াগেঁয়ে

২১

এই অট্টালিকায় যাঁর বাস, এত রাজা-রাজড়া এমন কি দেবতারা অবধি যাঁর দেখা পান না, তিনি কি কৃষ্ণ? সেই আমাদের রাধার পায়ে-পড়া ধন, পাঁচনবাড়ী হাতে রাখাল, এও কি সম্ভব? এ কৃষ্ণ সে কানু কখ্খনও নয়!

তবে উপায় কি? ব্রজগোপীরা না বড় দীপ জ্বালিয়ে যমুনায় ভাসিয়েছিলে? আমি না তোমাদের আশা পূর্ণ কর্‌বো! পথের পানে চেয়ে আমার ফের্‌তা পায়ের নূপুর শোন্‌বার অপেক্ষা কচ্ছ? আমাদের কানু কোথায় গেছে, কে

জানে—এখানে গরু কই? মাঠ কই? সে রাখাল কি এখানে আছে? এত বড় রাজ্যের রাজা হ'লে সে কি আর বাঁচ্তো? তার রাখালের প্রাণ ভয়েই মারা পড়্তো।

আমার খোঁজা তাঁকে বৃথা। এই বিপুল রাজ্যের রাজাধিরাজকে আমার মত নগণ্য প্রাণী কোথায় পাবে? এ যে বালকের দুই হাত উঁচু করে চাঁদ ধরার মত! এ আমার একেবারেই আয়ত্ত্বের মধ্যে নয়!

২২

সেইখানে একটি বেণে দাঁড়িয়ে পথের ওপার যেতে প্রতীক্ষা কচ্ছিল—বড়ড গাড়ী ঘোড়ার ভিড়, খানিকটা দাঁড়িয়ে,—যাবার ফাঁক পায় কি না, সে তাই দেখ্‌ছিল।

বৃন্দা তাকে বল্লেন, "বাছা, রাজপুরীর অন্তঃপুরের দোরটা কোন দিকে?"

সে বল্লে, "উত্তর দিকে, ঐ যে ডান দিকে সরু গলি দেখ্‌ছ, ওটি ধ'রে সোজা চলে যাও।"

এই বলে সে হাত বাড়াল। বৃন্দা বুঝ্‌তে পার্‌লে না, সে কি চায়?

সে বল্লে, "দেরী করে আর সময় নষ্ট

করতে পাচ্ছি না, শীঘ্র দামটা বার করে ফেল।”

“কিসের দাম?”

“এই যে পথ বাত্‌লিয়ে দিলুম ‘ও বুঝি শুধোশুধি?”

বৃন্দা তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন,—যেন কথার অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌লেন না।

সে লোকটা রুক্ষস্বরে বল্লে, “এ ছুঁড়ি হাবা না কি? পথ জিজ্ঞেস্ করে নিজের কাজ উদ্ধার ক’রে নিল। এখন আমার পারিশ্রমিক দেবার বেলা হাবা সেজেছেন! আমার সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শীগ্গির পয়সা ফেল।”

একটি ব্রাহ্মণ যুবক সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বুঝ্‌লেন—মেয়েটী পাড়াগেঁয়ে, মথুরার দরদস্তুর জানে না। তখন নিজের পুঁট্‌লী হ’তে পারিশ্রমিক বার কোরে দিয়ে

বল্লেন, "এই নাও তোমার পথ ব'লে দেওয়ার দাম।"

বৃন্দা সেই বামুনকে প্রণাম কোরে কিছু বল্‌বেন,' এমনই চেষ্টা কচ্ছেন, এর মধ্যে তিনি চলে গেছেন•।

বৃন্দা ভাব্‌লেন, এমন স্থানেও মানুষ থাক্‌তে পারে! বৃন্দাবনের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল; কিন্তু বৃন্দাবনের চাঁদকে না পেলে যে সে স্থান আঁধার!

২৩

অন্তঃপুরের দোরে গিয়ে অনেক কান্নাকাটি কোরে বৃন্দা এক দাসীর কৃপা লাভ করেছেন। সে খাস অন্দরের দাসী—বৃদ্ধা, সব-স্থানে তার গতিবিধি আছে।

কৃষ্ণ দ্বি-প্রহরের পর ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেই ঘরের দরজায় সোণার বেত হাতে নানারূপ কঞ্চুলিকা পরে হীরা, মণি ও পাখীর পালকের তাজ মাথায় দিয়ে মথুরাবাসিনীরা পাহারা দিচ্ছে। দাসী সেই দরজার কাছে এনে বৃন্দাকে রেখে গেল। সেই স্ত্রীলোক শান্ত্রীদের কোমরে সোণার শেকলে আঁটা হীরা-মতি বাঁধানো কোষে

তলোয়ার ঝুলানো রয়েছ। তাদের একজন এসে সেই বুড়ো দাসীকে জিজ্ঞেস্ কল্লে—"এ স্ত্রীলোক্ কে? মথুরেশের শয়ন-ঘরের কাছে কেন এনেছ?"

দাসী বল্লে, "এটি আমার বোন্ঝি, আহা বড় দুঃখিনী—রাজপুরী ঘুরে ঘুরে দেখ্ছে। মথুরেশ তো ঘুমুচ্ছেন, খানিকটা এখানে ব'সে বিশ্রাম কোরে চলে যাবে, এর জন্যে যদি কোন কথা ওঠে, তার জবাবদিহি আমার।"

২৪

স্ত্রীলোক শান্ত্রীরা আর কিছু বল্লে না। বৃন্দার সমস্ত দর্প চূর্ণ হোয়ে গেছে। রূপের দর্প? এ নাগরীদের পায়ের নখের কোণে যে রূপ, তার তা নেই! বুদ্ধির দর্প? পদে-পদে ঘাটে-ঘাটে লোকেরা তাকে বোকা ঠাওরিয়ে হেসেছে! প্রেমের দর্প? কার সঙ্গে প্রেম?—সিন্ধুর সঙ্গে বিন্দুর প্রেম—তা যে উপহাসের কথা। তাঁকে হাতে পাওয়ার কথা! যাঁকে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ইয়ত্তা করতে পারেন না, তাঁকে পাওয়া—সে তো স্বপ্ন-রাজ্যের পাওয়ার চেয়েও মিথ্যা।

তবে কাকে নিয়ে আরতি করেছি! কার কাছে একশ' বার ছুটে এসেছি! কার কাছ থেকে দাসখৎ নিয়েছি! কার গরুর রাখালীর কথা নিয়ে গল্প তৈরী করেছি! সে কে? সে বিরাট্—সে কে? তার সম্বন্ধে যা কিছু বলেছি, যা' কিছু শুনেছি, সে সমস্ত মিথ্যা! তার কুঞ্জে দীপ জ্বেলেছি, তার মুখ অলকা-তিলকা দিয়ে সাজিয়েছি—এ সমস্ত মিথ্যা! সে কে? এ কোথায় এসেছি? কূয়োর জীব হোয়ে মনে মনে করেছিলেম—সেইটাই জগৎ—সেখানে যা নেই, কোন জগতে তা নেই! আজ মহা-সমুদ্রের ধারে এসে দেখ্ছি এ কি অকূল! এ কি বিরাট্! আমাদের প্রাণ দিয়ে বড়াই কচ্ছি! এতটুকু জিনিষের দান, তাও আবার দান? সেই দাতার আবার মান? রাধা তুই কার জন্যে কাঁদ্ছিস্? হিমালয়ের একটুক্‌রা পাষাণের উপর মাথা

আছড়িয়ে ভাবছিস্, হিমালয়টা নড়্‌বে! হা অদৃষ্ট! বৃন্দাবনে কতকগুলি পাগল ব'সে ব'সে কাঁদছে, আর ভাব্‌ছে, সৃষ্টির একটা প্রলয় তারা কোচ্ছে!

২৫

বৃন্দা তবু সে স্থান ছাড়লেন না, কৃষ্ণ সেখানে আছেন ত ? যত বড় ঐশ্বর্য্য তার হোক্ না কেন, তাঁর পায়ের ধূলি-কণা যেখানে আছে, গোপী কি সে স্থান ছাড়তে পারে ?

বৃন্দা ব'সে ব'সে ভাব্ছেন, আর চোখ দিয়ে জল পড়্ছে। পাছে শান্ত্রীরা দেখ্তে পেয়ে ঠাট্টা করে, এই জন্য একটা আঙ্গুল আস্তে-আস্তে চোখের কোণে ঠেকিয়ে জলের ফোঁটা মুছে নিচ্ছেন। কিন্তু আর পারেন না, হঠাৎ অতি বড় দুঃখে তিনি চীৎকার কোরে বলে উঠ্লেন, "জয় রাধে !"—সে যে গোপীদের চির-অভ্যাস।

অমনই শান্ত্রীদের তরবারী কোষ হ'তে বার হোয়ে পড়্ল। তারা এসে বৃন্দাকে ঘিরে ধরে বল্লে, "এত বড় সাহস! এখানে চীৎকার কোরে মথুরেশের ঘুম ভাঙ্গাচ্ছিস্?" কাঁচলীর পেটী থেকে রেশমী দৃঢ় রজ্জু বার ক'রে তারা বৃন্দার কোমল কর দু'খানি বেঁধে ফেল্লে।

তখন সম্মুখে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ!

শান্ত্রীরা অভিবাদন কোরে শশব্যস্তে সরে দাঁড়াল।

তিনি বল্লেন, "খুলে দাও।"

অমনই বন্ধন মোচন হোল।

কৃষ্ণ তার হাত দুখানি ধোরে তাকে নিজের কক্ষে নিয়ে এলেন। বৃন্দা তাঁর পদে লুটিয়ে পড়লো।

"তারা বৃন্দার কোমল কর দুখানি বেঁধে ফেল্লে।"

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

২৬

কৃষ্ণ' বল্লেন, "দূতি, তুমিই এই শুষ্ক নগরীতে রাধার নাম কোরে আমার কাণে অমৃত ঢেলে দিয়েছিলে ?

"তুমি আমায় দেখে ভয় পেও না। এই দেখ রাজদণ্ড, কত হীরার গাঁথুনী ; যমদণ্ডের ন্যায় লোকে এ দেখে ভয় পায়। কিন্তু আমার বাঁশীটী বৃন্দাবনে ফেলে এসেছি। যে হাতে বাঁশী ছিল, সে হাতে কি এই রাজদণ্ড সাজে! আমার ময়ূর পাখা নেই, এই রাজমুকুটে কি আমার সে সাধ মিট্‌বে! সেই যে রাধার পায়ের ধূলো যার শিরোভূষণ, সে ময়ূরপুচ্ছের মূল্য কি এই রাজমুকুটের ?

"বৃন্দা, তোমায় দেখে বাঁচ্‌লুম ; রাজার ছদ্ম-বেশে যে, রাখালের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল—উঃ ! এই নগরের জ্বালায় জ্বলে যে তোমার গায়ের বাতাসে জুড়িয়ে গেলাম।"

বৃন্দা ভাল করে কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না। কেবল আধ-ভাবে বল্লেন "হে মথুরেশ, বড় ভয় পেয়েছি, অভয় দাও, আমরা তোমার—আমরা অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু এই ক্ষুদ্রদের সমস্তই তোমার। তুমি বল,—তুমি আমাদের সেই কানু কি না ? তোমার এ বেশ দেখে ভয় হচ্ছে। তোমার এ বেশের কাছে এগুতে পারি, আমরা এমন কি সুকৃতি করেছি ? পায়ে পড়ি বল, তুমি আমাদের সেই কানু কি না ?"

২৭

কৃষ্ণও যত্ন করে বৃন্দাকে উঠালেন এবং ব্রজের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগ্লেন এবং বল্লেন—"এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, আমি এক মুহূর্ত্ত রাইকে ভুল্তে পারি নি। সে না সংসারের জ্বালায় জ্বলে আমায় বল্তো—'কানু আমি যেখানে যাই, যত দুঃখ পাই, তোমার চাঁদ মুখের হাসি মনে করে সব কষ্ট ভুলে থাকি ? তুমি যদি নিষ্ঠুর হবে, আমায় ছাড়বে—তবে ওই খানে দাঁড়িয়ে দেখ আমি কেমন করে মরতে জানি।' রাই কেমন আছে দূতি বল।"

"রাইয়ের অবস্থা কি বল্‌বো। যেদিন আমি আস্‌ব, তার আগের দিন দেখি, রাই শুয়ে আছে, ওঠ্‌বার বল নেই, দিন রাত মুখে "কানু" "কানু" "কানু"। ক্ষীণ কণ্ঠে আমায় বল্লে,—'দূতি তার দোষ নেই, আমার ভাগ্যের দোষ। এ কি কেউ বিশ্বাস কর্‌বে? দূতি, আমি নদীর মোহনায় এসে তৃষ্ণায় ম'রে গেলেম! শ্রাবণ মাসের মেঘ আমায় এক ফোঁটা জল দিলে না, কে বিশ্বাস কর্‌বে? দূতি, চন্দন গাছ আমাকে দেখে সুগন্ধি লুকিয়ে রাখ্‌ল; কানুকে ভালবেসে আমার এই হবে তা কে জান্‌তো? এ আমার ভাগ্যের দোষ।'

"কখনও তার ভুল হয়েছে, যেন তুমি এসেছ! তখন যে লোক বিছানা হোতে উঠ্‌তে পারে না—সে শীর্ণ দেহে উঠে তোমায় অভ্যর্থনা কর্‌তে ব্যস্ত হয়। ললিতাকে বলে, 'তোরা আয়

না! তোরা ঘিরে দাঁড়া, আবার যদি চ'লে যায়! আয়, সবাই পায়ে পড়ি গিয়ে, এবং বলি আর মান করব না।'

"তখন ঝর ঝর কোরে চোখের জল পড়ে, আর বলেন; 'উনি এসেছেন, আজ বড় আনন্দের দিন, বামুন খাইয়ে উৎসব করতে হবে, তোরা যা' মধুমঙ্গলকে নিমন্ত্রণ করে আয়।' কখনও জোড় হাতে বলেন—'সখীরা আমায় শ্যাম-সোহাগিনী বলে, তাতে আমার মন গর্ব্বে ভরে ওঠে; আমার গর্ব্ব তুমি বাড়িয়েছ—এখন আমি কোথায় যাই? সকলের ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, স্বামী আছে—আমি ভেবে দেখেছি কানু বিনে আমার কেউ নেই, জন্মে জন্মে যেন কানু ছাড়া আমার কেউ না থাকে। আর যা থাকে তার বড় দুঃখ। আমি আর কিচ্ছু চাই না —জীবন-মরণে জন্মে-জন্মে তুমি আমার থেকো।'

"আরো কত কি বল্‌তে থাকে—তা আর কি বল্‌ব! হাঁ কৃষ্ণ, তুমি এমন সোণার রাইকে কেমন কোরে ভুলে আছ? সে যে তোমার বুকের ধন!"

২৮

তখন কৃষ্ণের চোখের জল মুক্তার হারের উপর পড়্‌তে লাগ্‌ল। তিনি বল্লেন—"যে দিন বৃন্দাবন ছেড়ে আসি, সে দিন তাকে কুঞ্জে যেতে বলে এসেছিলাম, মথুরায় এসে কংসকে না মার্‌লে সে রাত্রে ফিরে যেয়ে রাধার কুঞ্জে হাজিরী দিতে পার্‌ব না, এই ভাব্‌তে আমার গায়ে অসুরের বল এল। কিন্তু কংসকে মার্‌লুম, বসুদেব দৈবকী এসে জড়িয়ে ধল্লেন—আমার বৃন্দাবনে আর ফেরা হোল না। পিতা বল্লেন, 'তোমার জন্মে উৎসব কর্‌তে পারি নি; চোরের মত কারাগার হ'তে বার হয়ে তোমাকে নিয়ে গিয়েছিলুম—বৃন্দাবনে

তোমার জন্মোৎসব হোয়েছে। আমরা আজ তোমায় ছেড়ে দেব না।'

"কিন্তু আমি দিন গুণ্‌ছি। এক মুহূর্ত্ত রাইকে ভুলতে পাচ্ছিনি। আমার মা যশোদা পিতা নন্দ ও সখাদের খবর কি? কতদিন হোয়ে গেছে; কত বৎসর ঘুরে গেছে—মথুরায় বসে আমি কেবলই বৃন্দাবনের স্বপ্ন দেখ্‌ছি।"

বৃন্দা করজোড়ে বল্লেন—"সে সকল শুন্‌লে কষ্ট পাবে—তুমি কবে যাবে, বল?"

"কিন্তু দূতি আবার ব্রজে গেলে—সে দেশ কি তেমনি পাব? আর কি রাখালেরা আমায় তেমনি আদর-স্নেহের চক্ষে দেখ্‌বে? আর কি তোমরা আমার অভিসারের জন্য তেমনই নূপুর খুলে নীল সাড়ী পরে কুঞ্জে যেয়ে দীপ জ্বালিয়ে বসে থাক্‌বে?

২৯

"দুতি, আমি আর কি ব্রজ তেমনই পাব? ব্রজের ফুল কি তেমনই করে ফুট্‌বে? এই মথুরার রাজবেশ ভুলে আর কি ব্রজ আমায় তেমনই আপনার জন মনে কর্‌বে? সে গোচারণের মাঠ কি তেমনই আছে? দূতি, তুমি কি বল্‌তে পার, যা যেখানে রেখে এসেছি—তা ঠিক তেমনই আছে? সে লীলা হোয়ে গেছে—তাতে তোমাদের আশা মেটে নি, আমারও আশা মেটে নি। মা যশোদাকে নিয়ে আমার স্নেহলীলা ফুরায় নি, সখীরা আমায় আরও চায়, তা আমি জানি। আর রাইকে ছেড়ে থাকা আমারও

যেমন, তারও তেমন—এ আশা মিটেনি, মিটুতে হবে।

"দূতি, তুমি ফিরে যাও, ব'ল ব্রজের দীপ যেন না নিবে। রাধাকে বোল, আমি তার কুঞ্জে যাব—তোমরা যেয়ে প্রতীক্ষা করে থাক; তোমাদের এ লীলা আর শুধু রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড ঘিরে হবে না! এ লীলার লুট জগতে বিলুতে হবে! এমন আনন্দ যদি জগৎ-সংসার না পায়, তবে জগৎ বড় দুর্ভাগ্য।

"কংসের ধ্বংসের পর থেকে জগৎ জুড়ে প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের পূজা হোচ্ছে। বাঁশীর সুর বধির জগতের কাণে এখন পৌঁছাবে না; তাই বাঁশী এ যুগে আর বাজ্‌বে না।

"কিন্তু তোমরা বাঁশী শুনেছ, তোমরা সে সুর ভুলবে না; তোমরা দুঃখের মর্ম্ম বুঝেছ, তোমরা আমায় ভুল্‌বে না। আমি তোমাদের

পদাঙ্ক দেখে দেখে এ যুগ কাটিয়ে দেবো। তোমরা আমার বাঁশী শোনবার জন্য কাণ একাগ্র করে থেকো।

"এর পরের যুগে রাধা আর আমি এক হোয়ে যাব। তাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না; বনে বনে তাকে ডেকে আমি কাঁদব, সে আমার নাম ধরে কাঁদবে—দুই এক হয়ে বিরহ জ্বালা ঘুচবে।

"তোমরা বৃন্দাবনে আমার প্রতীক্ষা করে থেকো—বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য অমর করবার জন্য আমি যাচ্ছি। বৃন্দাবনের দীপ নিবিয়ো না।

ঐ দীপ জগতের দীপ হবে।

তোমরা সকলে আমাকে পাবে,—তোমাদের মধ্যে আমায় পাবে, কিন্তু তা ব্রজধামে কি কোন্ ধামে আমি তা বল্‌তে পারি না।"

৩০

কৃষ্ণ বৃন্দার চোখে তার কোমল হাত্ বুলিয়ে দিলেন।

হঠাৎ বৃন্দার মনে হোল, যেন জগৎ জুড়ে খোলের ধ্বনি জেগে উঠেছে। কত শত দীপ জ্বল্‌ছে, কত শত করতাল মৃদঙ্গ বাজ্‌ছে। রাধা-কৃষ্ণ যেন এক হয়ে ঢুলে ঢুলে নাচছেন ও পরস্পরকে আলিঙ্গন করে কাঁদছেন। ফাগের লাল বর্ণে আকাশ রাঙ্গিয়ে উঠ্‌ছে, যেদিকে তিনি মাথা ঢুলুতে ঢুলুতে নাম-গান করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যাচ্ছেন, শত শত দীপ এগিয়ে ধরে লোকেরা শ্রীমুখের শোভা দেখ্‌ছে। সেই

অভিসারের ভরে পৃথিবী যেন টল-মল কচ্ছে। ব্রহ্মার বাঞ্ছিত প্রেম যেন সুরধুনী-নীরের মত দুয়ারে দুয়ারে তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন।

বৃন্দা দেখ্‌লেন, তাঁরা সকলেই যেন সেই-খানে আছেন, কেউ চামর ঢুলুচ্ছেন : কেউ ব্যজন কচ্ছেন, কেউ তাঁর পাদপদ্মের ধূলি নিয়ে গায়ে মাখ্‌ছেন। কংসের মত দস্যুরা সেই প্রেমের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। শঙ্খ চক্র প্রভৃতি অস্ত্রের দরকার হয় নাই ;—চোখের জলই বৈষ্ণবাস্ত্র। তাতে তারা পরাস্ত হয়ে গেছে, প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে। গঙ্গা যমুনা যেন এক হয়ে গেছে। যেখানে যে নদী, তা যেন যমুনা হয়ে যাচ্ছে। যেখানে যে বন, তা যেন বৃন্দাবন হয়ে যাচ্ছে, যেখানে যে গিরি, তাই যেন গোবর্দ্ধন হয়ে যাচ্ছে। বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য এই ভাবে সর্ব্বত্র প্রচার হয়ে যাচ্ছে।

বৃন্দার চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ কোরে জল পড়ছে। তিনি কাঁদ্তে কাঁদ্তে পথ দেখ্তে পাননি।

* * * *

রাই গোপীদের সঙ্গে যখন দীপ হাতে এগিয়ে তাঁকে বরণ করে নিতে এসে উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'কানু কই?' তখন বৃন্দা বল্লেন, "তোমরা ঘরে ঘরে দীপ জ্বালিয়ে রেখো, তিনি কুঞ্জে আস্ছেন। কিন্তু এসে যেন দীপ নিবানো দেখে ফিরে না যান।"

সমাপ্ত

অধ্যাপক ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া
এম, এ, ডি লিট (লণ্ডন) মহাশয়ের পত্র

Messrs Gupta & Co. Senate house
CALCUTTA UNIVERSITY
March 9, 1920.

Dear Sirs,

With regard to your publication of the new series of Vaishnava tales I have to congratulate you that you could secure these latest writings of Rai Sahib Dinesh chandra Sen. These tales, judging from two of them I was privileged to hear, bristle with interest and deal with a theme that touches the hearts of the Bengali people. The tales seem to me to possess a peculiar charm enlivened by the writer's own religious experiences and devotional feelings. These are most original in conception, novel in method, charming in style and breathe throughout the deepest sentiments of the

Vaishnava poets in their native simplicity and emotional vigour. I had the honour of being present in one of the weekly meetings of the Vivekananda Society when the Rai Sahib read out his second tale, the Ragaranga, and I was delighted to find hundreds amongst the audience sharing with me the joy of listening to it which was a treat. It made a deep impression on them who seemed almost spell-bound when the tale was read.

Yours truly
Sd—B. M. Barua

কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাভাষার এম, এ, ক্লাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বৎবল্লভ মহাশয় বলেন—

"মুক্তাচুরি, রাগরঙ্গ, রাখালের রাজগি, শ্যামলী খোঁজা—চারি অমূল্য রত্ন। সাধ করে উহার একখানি পাইলে কণ্ঠমালার মধ্যমণি করিয়া পরি।" ১৫, ৩, ২০

শ্রীবসন্ত রায়

গত ১৯২০ সনের ৩১শে জানুয়ারী কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ আমাদিগকে লিখিয়াছেন।

শ্রীহরি শরণম্।

বিগত ৩১শে জানুয়ারী শনিবার বিবেকানন্দ সোসাইটীর একটি বিশেষ অধিবেশনে আমার সভাপতিত্বে রায় সাহেব

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "রাগরঙ্গ" নামক একটী আখ্যান পাঠ করিয়াছিলেন। গুপ্ত কোম্পানীর অনুরোধে সেই আখ্যান বিষয়ে আমি এই অভিমত প্রকাশ করিতেছি।

আমার বিবেচনায় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেই মহাশয়ের এই প্রকার আখ্যান দ্বারা আমাদের সাহিত্যের একটী নূতন ধারা প্রদর্শিত হইয়াছে—এই ধারায় বঙ্গ-সাহিত্য প্রাচীন নির্ম্মল রসসৃষ্টি দ্বারা এক নূতন আনন্দের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই আখ্যান পাঠ করিলে প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি নব্য শিক্ষিত-সমাজের সগৌরব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে বঙ্গসাহিত্যে যে অস্বাভাবিক বৈদেশিক ভাব-বাহুল্য ঘটনাচক্রে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা দেশের মঙ্গলের জন্য অনেক পরিমাণে অপসারিত হইবে।

১লা মার্চ্চ, ১৯২০।

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সংস্কৃত কলেজের প্রবীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন:—

গত ২৯শে মে সায়ংকালে বিবেকানন্দ সোসাইটীর বিশেষ অধিবেশনের সভাপতিরূপে আমি রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'শ্যামলী খোঁজা' শীর্ষক বক্তৃতার রস আস্বাদ করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। বাঙ্গালা দেশে আজকাল, চারিদিকে সাহিত্যের কুঞ্জে, কেবল ক্লারিওনেটের আওয়াজই শুনিতে পাই, খাটি বাঁশের বাঁশীর সেই সুর আর তেমনটা শুনিতে পাই না। মনের এই ক্ষোভ রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র দূর করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ সরল পদ্ধতিতে কৃষ্ণ-কথার ঝঙ্কার নবীনবঙ্গে এই বোধ হয় প্রথম। দীনেশবাবুর ভাব গদগদ কণ্ঠের প্রতি কথা সামাজিকদিগের যথার্থই "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিয়াছিল। মূর্চ্ছিতা রাজনন্দিনী শ্রীমতীর মূর্চ্ছা ভঙ্গের সেই মহামন্ত্র "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এখনও যেন শুনিতে পাইতেছি। দীনেশবাবু বঙ্গসাহিত্যের আজীবন সেবক বাঙ্গালার অন্যতম বসন্তের পিক; কিন্তু এই বার তিনি যে গান ধরিয়াছেন তাহাতে সেই সব "ফিকে" হইয়া গিয়াছে, তাঁহার এই পরিণত বয়সের ভক্তির উচ্ছ্বাসে বাঙ্গালীর প্রাণ আবার মাতিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। এ তৃপ্তি কোন সভায় আর এর পূর্ব্বে পাই নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

রাখালের রাজগি সম্বন্ধে প্রবাসী বলেন:—

কৃষ্ণের মথুরায় রাজা হওয়ার পর বৃন্দাবনবাসীদের বিরহ-ব্যাকুলতায় ও প্রণয়ের আন্তরিক আকর্ষণে কৃষ্ণের রাজকীয় অটলতা কেমন করিয়া বৃন্দাবনের কুঞ্জের দিকে টলিয়াছিল সেই পুরাতন কাহিনীটিকে লেখক কবিত্ব মধুর মুখের চলিত কথায় সহজ সরল করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; মাধুর্য্যের কাছে ঐশ্বর্য্যের পরাজয় দেখাইয়া হৃদয়বৃত্তির জয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বই শিশু ও বয়স্ক সকলেই তুল্য মনোরম হইয়াছে।"

'রাগরঙ্গ' সম্বন্ধে—

"রাধার মান ও রাগের রঙ্গ লইয়া এই কথা রচিত। রচনার ভাষা মাধুর্য্য ও ধরণে পুরাতন জিনিষ নূতনের মোহনতা অর্জ্জন করিয়াছে।"

মুক্তা চুরি সম্বন্ধে—

"রচনার ধরণ কবিত্বময় ও মনোরম।"

আমাদের পুস্তকালয়ে সকল প্রকার অর্ডার অতি শীঘ্র যত্নের সহিত সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

৪৯, রসারোড নর্থ, ভবানীপুর কলিকাতা।